আদর্শ মানব
মুহাম্মাদ (সা)

অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

আদর্শ মানব
মুহাম্মাদ (সা)

এ কে এম নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার ■ মগবাজার ■ কাঁটাবন

আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)

এ কে এম নাজির আহমদ

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

ISBN 984-611-000-6

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৪
পঞ্চদশ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
মাঘ ১৪২১
রবিউস সানি ১৪৩৬
প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার
কম্পোজ : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬
মুদ্রণে
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ বত্রিশ টাকা মাত্র

ADARSHA MANAB MUHAMMAD (SM) Written by A K M NAZIR AHMAD Published by Muhammad Golam Kibria, Ahsan Publication, Book & Computer Complex 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100 First Print June 1984 15th Print February 2015 Fixed Price Tk. 32.00 only ($ 1.00)

AP-12

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আইয়্যামে জাহিলিয়াত

আদম (আ) থেকে শুরু করে বহু নবীর কর্মক্ষেত্র ছিলো আরব দেশ। কালক্রমে আরবের লোকেরা নবীদের শেখানো জীবন বিধান ভুলে যায়। তাদের আকীদা বিশ্বাসে ঢুকে পড়ে বিকৃতি।

তারা আল্লাহকে সব চাইতে বড় খোদা বলে স্বীকার করতো। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা নিজেদের মনগড়া ছোটখাটো খোদাগুলোর পূজা উপাসনাই করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে মানুষের জীবনে এই সব খোদারই প্রভাব বেশী।

তারা এইসব মনগড়া খোদার নামেই মানত ও কুরবানী করতো। এদের কাছেই নিজেদের বাসনা পূরণের জন্য মুনাজাত করতো। তারা বিশ্বাস করতো, এই সব ছোটখাটো খোদাকে সন্তুষ্ট করলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করতো। জিনদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারের শরীক মনে করতো। যেই সব শক্তিকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করতো সেই সবের মূর্তি বানিয়ে তারা পূজা করতো।

ঈমানী বিকৃতির সাথে সাথে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ আরবদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো।

সুদী কারবার, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, জুয়াখেলা, নাচগান, মদপান, যিনা এবং এই জাতীয় বহু দুষ্কর্ম তাদেরকে প্রায় পশুতে পরিণত করেছিলো। তাদের বেহায়াপনা এতো চরমে উঠেছিলো যে নারী ও পুরুষ উলংগ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করতো।

কন্যা সন্তানকে তারা জীবন্ত কবর দিতো।

সেই সমাজে শ্রমজীবীরা ছিলো ক্রীতদাস।

গোত্রের সরদারদের খেয়ালখুশীই ছিলো আইন।

পার্শ্ববর্তী ইরান সাম্রাজ্যে তখন আগুনের পূজা হতো। দিন-রাত আগুন জ্বালিয়ে রেখে লোকেরা তার চারদিকে জড়ো হয়ে সিজদা করতো। বিশাল রোম-সাম্রাজ্যে তখন খৃস্টবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা মারইয়ামকে (আ) আল্লাহর স্ত্রী এবং ঈসাকে (আ) আল্লাহর পুত্র মনে করতো।

ইয়াহুদী ধর্মীয় নেতারা আল্লাহ-প্রদত্ত কিতাব বিকৃত করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করতো।

বিভ্রান্তি, বিকৃতি, শোষণ, নিপীড়ন, পাপাচার ও অপসংস্কৃতির এই যুগকেই বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়াত।

মুহাম্মাদ (সা) এলেন দুনিয়ায়

ঈসায়ী ৫৭১ সনের এপ্রিল মাসে তথা রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ (সা) কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের বাস গৃহে ভূমিষ্ঠ হন।

তাঁর আব্বা আবদুল্লাহ্ ইতোপূর্বে মারা যান।

আম্মা আমিনা শিশুপুত্রকে নিয়ে শ্বশুর আবদুল মুত্তালিবের ঘরে বসবাস করতে থাকেন।

মুহাম্মাদের (সা) জন্মসনে আবরাহার অভিযান

ইয়ামানের খৃস্টান বাদশাহ আবরাহা রাজধানী সা'না শহরে একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করে। অতঃপর সে আরবদের হাজ্জ অনুষ্ঠান কা'বা থেকে এই গীর্জায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই উদ্দেশ্যে সে কা'বা ধ্বংস করার জন্য ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মাক্কার দিকে অগ্রসর হয়। তার বাহিনীতে বেশ কিছু হাতীও ছিলো।

এটা ছিলো ঈসায়ী ৫৭১ সনের ঘটনা।

কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিব আছছিফাহ নামক স্থানে আবরাহার সংগে সাক্ষাৎ করে তাকে ধন-সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যাবার অনুরোধ জানান। আবরাহা কা'বা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে। আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যাবার নির্দেশ দেন।

কা'বার মধ্যে তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিলো। আবদুল মুত্তালিব সেইগুলোকে উপেক্ষা করে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন, "হে আল্লাহ, আপনার ঘর আপনি রক্ষা করুন!"

তারপর তিনি পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যান।

আবরাহা অগ্রসর হলো মাক্কার দিকে। মিনা ও মুজদালিফার মধ্যবর্তী মুহাসসির নামক স্থানে তার বাহিনী পৌঁছলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের উপর বৃষ্টির মতো পাথর খণ্ড ফেলতে লাগলো।

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

"এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন যারা তাদের উপর পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করছিলো। ফলে তাদের অবস্থা হলো চিবানো ভূষির মতো।" (সূরা আল-ফীল ঃ ৩-৫)

মুহাম্মাদের (সা) বাল্যজীবন

সুয়াইবাহ নামক এক মহিলা হন শিশু মুহাম্মাদের (সা) প্রথম দুধ-মা। পরে হালীমাহ আস্ সা'দীয়াহ শিশু মুহাম্মাদ (সা) কে নিয়ে এলেন চির স্বাধীন মরু বেদুইনদের মাঝে। ছয় বছর বয়সে মুহাম্মাদ ফিরে এলেন তাঁর আম্মার কাছে। আম্মা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব যান।

স্বামীর কবর দেখা ও আত্মীয় বাড়িতে প্রায় মাস খানেক থাকার পর আমিনা পুত্রকে নিয়ে মাক্কার দিকে রওয়ানা হন। আবওয়া নামক স্থানে আমিনা মৃত্যু বরণ করেন।

দাসী উম্মু আইমান মুহাম্মাদকে (সা) মাক্কায় নিয়ে আসেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ ছায়ায় মুহাম্মাদ (সা) পালিত হতে থাকেন।

মুহাম্মাদের (সা) বয়স যখন আট, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও মারা যান। এবার চাচা আবু তালিব মুহাম্মাদের (সা) লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় আযইয়াদ উপত্যকায় মুক্ত আকাশের নীচে মুহাম্মাদ (সা) মেষ চরাতেন।

বারো বছর বয়সে মুহাম্মাদ (সা) চাচা আবু তালিবের সংগে সিরিয়া সফর করেন।

যুদ্ধের ময়দানে যুবক মুহাম্মাদ (সা)

মুহাম্মাদের (সা) বয়স তখন ১৫ বছর। কুরাইশ ও কাইস গোত্রের মাঝে পুরানো শত্রুতার কারণে যুদ্ধ বাঁধে।

এই যুদ্ধে কুরাইশগণ ন্যায়ের উপর ছিলো।

মুহাম্মাদ (সা) কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যান।

কিন্তু তিনি কারো প্রতি আঘাত হানেননি।

যুদ্ধে কুরাইশরা জয়ী হয়।

এই যুদ্ধেরই নাম ফিজারের যুদ্ধ।

হিলফুল ফুদুল

যুদ্ধ ছিলো আরবদের নেশা। শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো। মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। সবাই আতংকের মধ্যে দিন কাটাতো। আয্ যুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব ছিলেন একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি। তিনি এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময় করেন। অনুকূল সাড়াও পেলেন। শিগগিরই গড়ে উঠলো একটি সংগঠন। নাম তার হিলফুল ফুদুল। মুহাম্মাদের (সা) বয়স তখন সতর বছর। তিনি সানন্দে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন।

হিলফুল ফুদুলের পাঁচ দফা

(১) আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।

(২) পথিকের জান-মালের হিফাজত করবো।

(৩) অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবো।

(৪) মাযলুমের সাহায্য করবো।

(৫) কোন যালিমকে মাক্কায় আশ্রয় দেবো না।

হাজরে আসওয়াদ বিরোধ মীমাংসা

পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত কা'বা।

একবার পাহাড়ের পানি এসে তার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। কুরাইশগণ নতুনভাবে গড়ে তোলে কা'বার দেয়াল।

নির্মাণ কালে হাজরে আসওয়াদ কা'বার কোণ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। দেয়াল নির্মাণের পর পাথরটি আবার স্বস্থানে বসাতে হবে।

কুরাইশদের সব খান্দান এই মহান কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। এই নিয়ে শুরু হলো বিবাদ। যুদ্ধ বেঁধে যাবার উপক্রম। আবু উমাইয়াহ ইবনুল মুগীরাহ প্রস্তাব দেন যে, যেই ব্যক্তি সবার আগে কা'বা প্রাঙ্গণে পৌছবে তার উপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেয়া হবে। সে যেই সিদ্ধান্ত দেবে তা সবাই মেনে নেবে। সকলে এই প্রস্তাব মেনে নেয়।

অতঃপর দেখা গেলো সকলের আগে ধীর পদে এগিয়ে আসছেন এক যুবক। মুহাম্মাদ (সা)।

সবাই ছুটে এলো তাঁর কাছে। ফায়সালার দায়িত্ব তুলে দিলো তাঁর হাতে।

তিনি একটি চাদর আনার নির্দেশ দেন। চাদর এনে বিছানো হলো। মুহাম্মাদ (সা) নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক খান্দানের এক একজন প্রতিনিধিকে চাদর ধরে উপরে তুলতে বললেন। সকলে মিলে পাথরটি নিয়ে এলো কা'বার দেয়ালের কাছে। মুহাম্মাদ (সা) চাদর থেকে পাথরটি তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন।

সবাই খুশী।

এড়ানো গেলো একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ (সা)

মুহাম্মাদের (সা) চাচা আবু তালিব একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিশোর মুহাম্মাদ (সা) চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া সফর করেন। যৌবনে তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন।

লোকেরা তাঁর সততায় মুগ্ধ ছিলো। অনেকেই মূলধন দিয়ে তাঁর সাথে ব্যবসায় শরীক হতে লাগলো। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি সিরিয়া, বাসরা, বাইরাইন ও ইয়ামান গমন করেন।

ওয়াদা পালন, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তিনি একজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। সকলে তাঁকে নতুন নামে ডাকতে শুরু করে।

সেই নাম 'আল-আমীন'।

খাদীজা ছিলেন একজন ধনী মহিলা। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীও মারা যান।

খাদীজা যেমনি ধনশালিনী ছিলেন তেমনি ছিলেন সচ্চরিত্রা।

এই পবিত্র মহিলাকে লোকেরা 'আত্ তাহিরাহ' বলে ডাকতো।

বিধবা খাদীজা পুঁজি দিয়ে লোকদের দ্বারা ব্যবসা চালাতেন। মুহাম্মাদের (সা) ব্যবসায়িক যোগ্যতা ও সততার কথা তাঁর কানে গেলো। তিনি মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। মুহাম্মাদ (সা) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি বেশ কয়েকবার সিরিয়া যান এবং প্রচুর মুনাফা উপার্জন করেন।

বিবাহ

মুহাম্মাদের (সা) আমানাতদারী ও ব্যবসায়িক যোগ্যতা খাদীজাতুল কুবরাকে মুগ্ধ করে। খাদীজা মুহাম্মাদের (সা) নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মাদ (সা) এই সচ্চরিত্রা মহিলার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট দিন চাচা আবু তালিব, হামজা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মুহাম্মাদ (সা) খাদীজার বাড়িতে উপস্থিত হন। পাঁচ শো দিরহাম মুহরানা ধার্য হয়। আবু তালিব বিয়ে পড়ান। বিবাহকালে খাদীজার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। মুহাম্মাদের (সা) বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।

শিরক থেকে আত্মরক্ষা

তখন মাক্কা ছিলো মূর্তি পূজার প্রধান কেন্দ্র। কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। কুরাইশরা ছিলো কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। তাদের তত্ত্বাবধানে পূজা হতো।

মুহাম্মাদ (সা) কোনদিন পূজায় অংশ নেননি। কোনদিন তিনি মূর্তির কাছে মাথা নত করেননি। এই সব কিছু তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হতো। তাঁর বিবেক তাঁকে শির্‌ক থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

অধীন ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ

খাদীজার ভাইয়ের ছেলে হাকিম ইবনু হিযাম তাঁকে একজন কেনা বালক উপহার দেন। খাদীজা সেই ছেলেটিকে তাঁর স্বামী মুহাম্মাদের (সা) হাতে তুলে দেন।

সাধারণতঃ ক্রীতদাসের প্রতি মনিবেরা দুর্ব্যবহার করতো। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন ভিন্ন রকমের মানুষ। তিনি ক্রীতদাসের প্রতি সদাচরণ করতেন।

তাঁর নিকট হস্তান্তরিত ক্রীতদাসের নাম ছিল যায়িদ ইবনু হারিসা। যায়িদ মুহাম্মাদের (সা) কাছে এসে টের পেলো তাঁর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।

যায়িদের আব্বা হারিসা এবং চাচা কা'ব জানতে পেলো যে যায়িদ মাক্কায় আছে। তারা তাকে মুক্ত করে নেয়ার জন্যে মাক্কায় আসে। মুহাম্মাদের (সা) সাথে দেখা করে তারা যায়িদকে মুক্ত করে দেয়ার অনুরোধ জানায়।

মুহাম্মাদ (সা) জানালেন এতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যায়িদ যেতে রাজি হলো না।

যায়িদের আব্বা স্বাধীনতার পরিবর্তে গোলামিকে বেছে নেয়ায় তার ছেলেকে তিরস্কার করলো। যায়িদ বললো, "আমি মুহাম্মাদের জীবনে এমন সব গুণ দেখেছি যার কারণে আর কাউকে শ্রেয় ভাবতে পারি না।" এই কথা শুনে মুহাম্মাদ (সা) যায়িদকে কা'বার কাছে নিয়ে আযাদ করে দিলেন ও তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। এই সব দেখে যায়িদের আব্বা ও চাচা অবাক হলো। খুশী মনে যায়িদকে মুহাম্মাদের (সা) কাছে রেখে তারা বাড়ি ফিরে গেলো।

হিরা গুহায় অবস্থান

আরবের জাহিলী পরিবেশ দেখে মুহাম্মাদ (সা) মনে খুব জ্বালা অনুভব করতেন। শিরক, যুল্‌ম ও পাপের পথ থেকে কাউমকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়– বসে বসে তিনি তাই ভাবতেন।

কা'বা থেকে তিন মাইল দূরে নূর পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটি গুহা। নাম তার হিরা গুহা।

মুহাম্মাদ (সা) প্রতি বছর এক মাস এই গুহাতে কাটাতেন।

প্রথম ওহী প্রাপ্তি

মুহাম্মাদের (সা) বয়স তখন চল্লিশ বছর।

তিনি হিরা গুহায় বসে ভাবতেন।

মাহে রামাদানের শেষ ভাগ।

একদিন এক ফিরিশতা এসে হাজির হলো তাঁর সামনে।

এই ফিরিশতার নাম জিবরাঈল।

এই ফিরিশতার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদের (সা) নিকট পৌঁছালেন এই বাণী-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পড় স্রষ্টা রবের নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড় এবং তোমার রব অতীব সম্মানিত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সব শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না।" (সূরা আল আলাক ঃ ১-৫)

এইভাবে মুহাম্মাদ (সা) প্রথম ওহী পেলেন। তিনি হলেন নবী।

অভিভূত মুহাম্মাদ (সা) বাড়ি ফিরে এলেন।

স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ

"আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও।"

আল্লাহর দিকে আহ্বান

প্রথম ওহী নাযিলের পর কেটে গেলো প্রায় ছ'টি মাস। এবার দাওয়াতী কাজের সূচনা করার জন্যে নির্দেশ এলো–

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

"হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো এবং লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। পোশাক পবিত্র রাখ। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। বেশী পাওয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না। তোমার রবের খাতিরে বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ কর।" (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৭)

এই নির্দেশ পাওয়ার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক একজন ব্যক্তির কাছে গিয়ে আল্লাহর সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে লাগলেন। আর এই পৃথিবীর জীবনে কর্তব্য সম্বন্ধেও তাদেরকে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

প্রথম যাঁরা সাড়া দিলেন

নীরবে চলছিল দাওয়াতে দীনের কাজ। একেবারে শুরুতে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হচ্ছেন–

১. খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ (রা),

২. আলী ইবনু আবি তালিব (রা),

৩. যায়িদ ইবনু হারিসাহ (রা),

৪. আবু বাকর ইবনু আবি কুহাফা (রা),

৫. উসমান ইবনু আফফান (রা),

৬. আয্‌যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা),

৭. আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (রা),

৮. সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা),

৯. তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা),

১০. আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা),

১১. আবু সালামাহ ইবনু আবদিল আসাদ (রা),

১২. আল আরকাম ইবনু আবিল আরকাম (রা),

১৩. উসমান ইবনু মাযউন (রা),

১৪. কুদামা ইবনু মাযউন (রা),

১৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাযউন (রা),

১৬. উবাইদাহ ইবনুল হারিস (রা),

১৭. সাঈদ ইবনু য়ায়িদ ইবনু আমর (রা),

১৮. ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব (রা),

১৯. আসমা বিনতু আবি বাকর (রা),

২০. আয়িশা বিনতু আবি বাকর (রা),

২১. খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা),

২২. উমাইর ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা),

২৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা),

২৪. মাসউদ ইবনু কারী (রা),

২৫. সালীত ইবনু আমর (রা),

২৬. আইয়াশ ইবনু আবি রাবীয়া (রা),

২৭. আসমা বিনতু সুলামা (রা),

২৮. খুনাইস ইবনু হুযাফাহ (রা),

২৯. আমের ইবনু রাবীয়া (রা),

৩০. আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রা),

৩১. আবু আহমাদ ইবনু জাহাশ (রা),

৩২. জা'ফর ইবনু আবি তালিব (রা),

৩৩. আসমা বিনতু উমাইস (রা),

৩৪. হাতিব ইবনুল হারিস (রা),

৩৫. ফাতিমা বিনতু মুজাল্লাল (রা),

৩৬. হুতাব ইবনু মুহাল্লাল (রা),

৩৭. ফুকাইহা বিনতু ইয়াসার (রা),

৩৮. মা'মার ইবনুল হারিস (রা),

৩৯. সায়েব ইবনু উসমান ইবনু মাযউন (রা),

৪০. মুত্তালিব ইবনু আযহার (রা),

৪১. রামলাহ্ বিনতু আবি আউফ (রা),

৪২. নাঈম ইবনু আবদিল্লাহ (রা),

৪৩. আমের ইবনু ফুহাইরা (রা),

৪৪. খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আস (রা),

৪৫. আমীনা বিনতু খালাফ (রা),

৪৬. হাতিব ইবনু আমের (রা),

৪৭. আবু হুযাইফা ইবনু উতবা ইবনু রাবীয়া (রা),

৪৮. ওয়াকিদ ইবনু আবদিল্লাহ্ (রা),

৪৯. খালিদ ইবনু বুকাইর (রা),

৫০. আমের ইবনু বুকাইর (রা),

৫১. আকিল ইবনু বুকাইর (রা),

৫২. ইয়াস ইবনু বুকাইর (রা),

৫৩. আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) ও

৫৪. সুহাইব ইবনু সিনান (রা)

এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক ও যুবতী।

কা'বার অদূরেই ছিলো আল আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘর। সেই ঘরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিমদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই দারুল আরকামই মুসলিমদের প্রথম শিক্ষালয়।

প্রকাশ্য আহ্বান

কেটে গেলো তিনটি বছর।

নবীর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো একটি ছোট সংগঠন। এবার আল্লাহ নির্দেশ দিলেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ.

"যেই বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হচ্ছো তা প্রকাশ্যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কর।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৯৪)

মুহাম্মাদ (সা) কা'বার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে উঠে জোরে আওয়াজ দিলেন- 'ইয়াসাবা-হাহ'।

কোন বিপদ দেখলে উঁচু স্থানে উঠে আরবগণ এই সাংকেতিক কথা উচ্চারণ করতো। সংকেত বাণী শুনে লোকেরা দৌড়ে আসতো। মুহাম্মাদের (সা) মুখে এই সংকেত বাণী শুনেও তারা ছুটে এলো।

সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ (সা) বললেন,

"শোন, আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং মূর্তি পূজার পরিণাম থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে চাচ্ছি। তোমরা যদি আমার কথা না মান, তাহলে তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করে দিচ্ছি।"

মুশরিক কুরাইশরা অসন্তুষ্ট হয়। গোসসা প্রকাশ করতে করতে তারা সেই স্থান ত্যাগ করে।

এই প্রকাশ্য আহ্বান শুনার পর মাক্কায় দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মুখে মুখে এই কথা আলোচিত হতে থাকে।

এরি মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) একদিন আবদুল মুত্তালিব খান্দানকে এক ভোজ সভায় দাওয়াত দেন। আবু তালিব, হামজা, আব্বাস প্রমুখ সেই ভোজ সভায় আসেন। খাওয়া শেষে মুহাম্মাদ (সা) দাঁড়িয়ে বলেন,

"আমি এমন কিছু নিয়ে এসেছি যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যথেষ্ট। এই বিরাট বোঝা বহনে কে আমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন?"

সবাই নিশ্চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। বালক আলী ইবনু আবি তালিব রাসূলের সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন, -"আমি আপনার সহযোগিতা করতে থাকবো।"

কেটে গেলো আরো কিছু দিন। মুহাম্মাদ (সা) একদিন গেলেন কা'বার নিকটে। ঘোষণা করলেন- 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' মুশরিকেরা নবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হারিস ইবনু আবীহালাহ (রা) তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মুশরিকদের তলোয়ারের আঘাতে তিনি শহীদ হন। আল্লাহর অনুগ্রহে মুহাম্মাদ (সা) নিরাপদে রইলেন।

বিরোধিতা

আল্লাহর রাসূল (সা) মাক্কার প্রতিটি ঘরে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান পৌঁছাতে থাকেন। মুশরিকরা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। গালমন্দ দিতে থাকে। বানোয়াট কথা ছড়িয়ে তাঁর সততা সম্পর্কে লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তাঁকে পাগল বলা হয়। কবি ও যাদুকর বলা হয়। লোকেরা যাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারে তার জন্যে পাহারা বসানো হয়।

চাপ প্রয়োগ

কুরাইশদের বিরোধিতা চলতে থাকে। ফলে লোকদের মনে ইসলাম সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। গোপনে লোকেরা নবীর সাথে দেখা করতে আসে। তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে ঘরে ফেরে। মুশরিকরা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদের (সা) সহযোগিতা করতেন। একদিন কুরাইশদের একদল তাঁর কাছে গিয়ে হাজির। তারা বললো,

"তুমি সরে পড়, আমরা ব্যাপারটা চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে ফেলি। নয়তো তুমি তাকে বুঝিয়ে ঠিক কর।"

একদিন আবু তালিব মুহাম্মাদের (সা) নিকট কথাটা পাড়লেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে নবী বললেন, "আল্লাহর কসম, ওরা যদি আমার এক হাতে চাঁদ ও আরেক হাতে সূর্য এনে দেয়, তবুও আমি আমার কর্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবো না।"

প্রলোভন

কুরাইশ সরদাররা এবার নতুন ফন্দি আঁটলো। একটি প্রস্তাবসহ উৎবা ইবনু রাবিয়াকে পাঠানো হলো আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে।

উৎবা বললো, "মুহাম্মাদ, তুমি কি চাও? মাক্কার শাসন কর্তৃত্ব চাও? কোন বড়ো ঘরে বিয়ে করতে চাও? অনেক ধন সম্পদ চাও? আমরা এই সব তোমাকে দিতে পারি। মাক্কা তোমার অধীন করে দিতে পারি। অন্য কিছু চাইলে তা দিতে পারি। কিন্তু তুমি এই কাজ থেকে বিরত হও।"

উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) আল কুরআনের এ বাণী পড়ে শুনালেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۔
وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۔ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى
اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۔ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ع قُلْ اَئِنَّكُمْ
لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ
فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۔ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى
السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا

طَآئِعِيْنَ. فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۖ

وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ.

"হা-মীম, এটি দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত। এটি এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল-আরবী ভাষার কুরআন– তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুনেও শুনে না। তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যেই জিনিসের দিকে ডাকো তার প্রতি আমাদের দিলের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে। আমাদের কান বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটা পর্দা আড়াল হয়ে গিয়েছে। তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকবো।

হে নবী, এই লোকদেরকে বল, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর অভিমুখী হয়ে থাক, তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং মুশরিকদের ধ্বংস সুনিশ্চিত যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। যারা ঈমান আনলো ও নেক আমল করলো তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে।

হে নবী, তাদেরকে বল, তোমরা কি সেই সত্তার কুফরি করছো ও অন্যদেরকে তার সমকক্ষ বানাচ্ছো যিনি পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন? তিনিই তো রাব্বুল আলামীন। তিনি পৃথিবীর বুকে উপর থেকে পাহাড় গেঁড়ে দিয়েছেন এবং এতে বরকতসমূহ সংস্থাপন করেছেন। তিনি এতে সব প্রার্থীর জন্যে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন।

এই সব চারদিনে সম্পন্ন করা হলো। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন। তা তখন শুধু ধোঁয়া ছিলো। তিনি আসমান ও যমিনকে বললেন, অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বললো, আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

তখন তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন এবং প্রতি আসমানে বিধি-বিধান ওহী করা হলো। আর দুনিয়ার আসমানকে আমি প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং একে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করলাম। এই সব কিছুই এক মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞ সত্তার পরিকল্পনা। এখন এই সব লোক যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে বল ঃ "আমি তোমাকে তেমনি ধরনের সহসা ভেঙ্গে পড়া আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন আদ ও সামুদের উপর নাযিল হয়েছিলো।" (সূরা হামীম আস সাজদা ঃ ১-১৩)

উৎবা এই বাণী শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার মন বলে উঠে যে এ সত্যিই আল্লাহর বাণী। মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেলো সে কুরাইশ সরদারদের কাছে। সে বললো, "মুহাম্মাদ যেই বাণী পেশ করছে তা কবিত্ব নয়, অন্য কিছু। তাকে তার নিজের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেয়া উচিৎ। সে যদি আরবের উপর বিজয়ী হতে পারে তাতে তোমাদেরও সম্মান বাড়বে। আর তা না হলে আরব তাকে ব্যর্থ করে ছাড়বে।"

কুরাইশ সরদারগণ তার এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি।

যুল্‌ম-নির্যাতন

মুশরিক শক্তি এবার ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খাববাবকে (রা) তাঁর মনিব জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দেয়। এক ব্যক্তি তাকে পা দিয়ে চেপে ধরে রাখে। বিলালকে (রা) তার মনিব মরুভূমির গরম বালুর উপর শুইয়ে রেখে বুকে পাথর চাপা দেয়। আম্মারকে (রা) পিটিয়ে পিটিয়ে বেহুঁশ করে দেয়া হয়। নানাভাবে মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। সেই নির্যাতনের শিকার হলেন অনেক পুরুষ। অনেক নারী।

হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরাত

ইসলামী দাওয়াতের পঞ্চম বছর। কুরাইশদের অত্যাচার বেড়েই চলছে। মুসলিমদের জন্য মাক্কার পরিস্থিতি জাহান্নামের মতো হয়ে উঠে। আল্লাহর রাসূল (সা) একদল মুসলিমকে হিজরাতের নির্দেশ দেন। পনর জনের একটি দল তৈরি হয়। এঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন মহিলা। বন্দরে তাঁরা একটি জাহাজ পেয়ে

যান। লোহিত সাগরের ঢেউ ঠেলে তাঁরা পৌঁছেন হাবশায়। আত্মীয়-স্বজন, ঘরদোর ও ধনসম্পদ ত্যাগ করে ঈমান নিয়ে তাঁরা হাবশায় (ইথিওপিয়া) পৌঁছেন। হিজরাতের খবর পায় মুশরিকরা। তারা হাবশার নাজাসী আসহামার কাছে প্রতিনিধি দল পাঠায়। প্রতিনিধিরা মুসলিমদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য নাজাসীকে অনুরোধ জানায়। নাজাসী মুসলিমদের বক্তব্য শুনেন। তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মে যে ঈসা (আ) যেই নবীর আগমনের কথা বলেছিলেন তিনি এসে গেছেন। নাজাসী মুসলিমদেরকে নিরাপদে তাঁর দেশে থাকার অনুমতি দেন। পরে তিনি নিজেও মুসলিম হন।

কুরাইশদের সমাবেশে মুহাম্মাদ (সা)

ইসলাম প্রচারের পঞ্চম বছর। মাহে রামাদান। কা'বার কাছে কুরাইশদের এক সমাবেশ। মুহাম্মাদ (সা) উঠে দাঁড়ালেন। পেশ করলেন একটি ভাষণ। সেই ভাষণটি ছিলো আল কুরআনের সূরা আন্-নাজম।

কারো মুখে রা ছিলো না। মন্ত্র মুগ্ধের মতো সবাই তা শুনছিলো। ভাষণ শেষ হলো। মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করলেন। সংগে সংগে গোটা জন-সমাবেশ সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। মুশরিক কুরাইশরাও সেই ভাষণ শুনে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলো যে যন্ত্রচালিতের মতো তারা মুহাম্মাদের (সা) অনুকরণে সিজদাবনত হয়।

হামজার ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম প্রচারের ৬ষ্ঠ বছর। মুসলিমদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। একদিন আবু জাহাল আল্লাহর রাসূলের (সা) সংগে দুর্ব্যবহার করে। সেই সময় হামজা ছিলেন শিকারে। শিকার থেকে ফিরে এসে তিনি এই ঘটনা শুনতে পান। মুহাম্মাদের (সা) প্রতি দুর্ব্যবহার! এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। শিকারের তীর ধনুক তখনো তাঁর হাতে। এইগুলো নিয়েই তিনি ছুটলেন কা'বার দিকে। আবু জাহালকে পেলেন ওখানে। তীব্র ভাষায় বকলেন তাকে। তারপর ঘোষণা করলেন, "আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম।"

উমারের ইসলাম গ্রহণ

উমার ছিলেন কট্টর ইসলাম-বিরোধী। একদিন তিনি মুহাম্মাদকে (সা) উত্যক্ত করার জন্য বের হন। আল্লাহর রাসূল (সা) কা'বার নিকটে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে তিনি আল্লাহর বাণী পড়ছিলেন। উমার নিকটে দাঁড়িয়ে তা শুনতে থাকেন। তাঁর মনে দোলা লাগে। তিনি সরে পড়েন সেখান থেকে। মন আবার কঠিন করে নেন।

একদিন তিনি আল্লাহর রাসূলকে (সা) হত্যা করার উদ্দেশ্যে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বের হন। পথে এসে শুনেন তাঁর বোন ফাতিমা ও তাঁর স্বামী মুসলিম হয়ে গেছেন। উমার ভীষণ রেগে যান। সোজা এসে পৌঁছেন বোনের বাড়ী। তাঁরা তখন আল্লাহর বাণী পড়ছিলেন। উমারকে দেখে তাঁরা তাড়াতাড়ি আল কুরআনের অংশটুকু লুকিয়ে ফেলেন। "তোমরা নাকি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছো?" -বলেই উমার ভগ্নিপতিকে মারতে শুরু করেন। ফাতিমা স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। উভয়ে আহত হন। শরীর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে তাজা খুন। তাঁরা বলেন, "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমার কোন অত্যাচারই আমাদেরকে এই পথ থেকে সরাতে পারবে না।" এবার উমার জানতে চাইলেন তাঁরা কি পড়ছিলেন। ফাতিমা আল কুরআনের অংশটুকু তাঁর হাতে দিলেন। এতে সূরা ত্বা-হা লিখা ছিলো। তিনি পড়তে শুরু করেন।

إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

"আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব আমারই ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণের জন্যে ছালাত বা নামায কায়েম কর।" (সূরা তা-হা ঃ ১৪)

এই আয়াত পর্যন্ত পড়ার পর উমারের মনে ইসলামের আলো জ্বলে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

আল্লাহর রাসূল (সা) তখন দারুল আরকামে। উমার সোজা সেখানে গেলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "কেন এসেছো, উমার?"

তিনি জবাব দিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে।" মুহাম্মাদ (সা) বলে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার।"

সমস্বরে মুসলিমরা বলে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার।"

এটাও ইসলামী দাওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের ঘটনা।

শিয়াবে আবু তালিবে আটক

উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমরা কা'বার চত্বরে প্রকাশ্যভাবে ছালাত আদায় করতে শুরু করে। এতে বেশ হাংগামা হয়। কিন্তু মুশরিকরা মুসলিমদেরকে ছালাত আদায় করার সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। এতে কুরাইশ সরদারদের রাগ চরমে উঠে। তারা ভাবলো, বানু হাশিমের সহযোগিতাই মুহাম্মাদের (সা) শক্তির উৎস। তাই বানু হাশিমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সকলে মিলে বানু হাশিমকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বয়কট চুক্তি অনুযায়ী সবাই বানু হাশিমের সাথে মেলা মেশা বন্ধ হয়ে করে। তাদের কিছু কেনা ও তাদের নিকট কিছু বেচা বন্ধ হয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়। বলা হলো, হত্যার জন্য মুহাম্মাদকে তাদের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত এই বয়কট চলতে থাকবে।

আবু তালিব বানু হাশিমের লোকদেরকে নিয়ে শিয়াবে আবু তালিব নামক গিরি সংকটে আশ্রয় নেন।

আবু লাহাব ছাড়া বানু হাশিমের মুসলিম-অমুসলিম সকল সদস্যই মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গী হন। আটক অবস্থায় তাঁদেরকে থাকতে হয় তিন বছর।

এই তিন বছরে তাঁদেরকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। খাদ্যাভাবে অনেক সময় গাছের পাতা ও ছাল খেতে হয়েছে। শুকনো চামড়া চিবিয়ে চিবিয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করতে হয়েছে। পানির অভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট পেতে হয়েছে।

তিন বছর পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বন্দীদশা থেকে তাঁদের মুক্তির পথ করে দেন। বানু হাশিম খান্দানের এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট দেখে একদল যুবকের মন বিগলিত হয়। তারা এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে ছিলো মুত'ইম ইবনু আদি, আদি ইবনু কাইস, যামআহ ইবনুল আসওয়াদ, আবুল বুখতারী, জুহাইর এবং হিশাম ইবনু আমর। তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আবু জাহালের নিষেধ অমান্য করে বানু হাশিমকে মুক্ত করে আনে। এটা ছিলো নবুয়াতের নবম সনের ঘটনা।

দুইজন আপনজনের ইন্তিকাল

শিয়াবে আবু তালিবের বন্দীদশা বুড়ো আবু তালিবের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দেয়। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পরই তাঁর ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিলো ৮৭ বছর। এর কিছুদিন পরই রাসূলের প্রিয়তমা জীবন সংগিনী খাদীজাতুল কুবরা ইন্তিকাল করেন। আবু তালিব ও খাদীজার (রা) ইন্তিকালে মুশরিকরা উল্লসিত হয়। এবার তারা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের উপর চরম অত্যাচার শুরু করে।

তাইফ গমন

মাক্কার সত্য সন্ধানী মানুষেরা ইসলামী সংগঠনে এসে গিয়েছিলো। নতুন কোন লোকই আর ইসলামী দাওয়াত কবুল করছিলো না। আল্লাহর রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত নেন, তাইফ গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে হবে।

তাইফে তখন অনেক ধনী ও প্রভাবশালী লোক বাস করতো। মুহাম্মাদ (সা) তাদের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। এই সব প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর কথায় কান দিলো না। কেউ কেউ তাঁকে খুব বিদ্রূপ করে। তারা মুহাম্মাদের (সা) পেছনে শহরের গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেয়।

গুণ্ডাদল নবীর পিছু নেয় ও তাঁর প্রতি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করতে থাকে। আল্লাহর রাসূলের (সা) সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে তাঁর স্যান্ডেলে জমা হয়। এক সময় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি আশ্রয়ের জন্য একটি বাগানে ঢুকে পড়েন। আল্লাহর রাসূল (সা) তাইফবাসীর নিকট ইসলাম পেশ করেন। চরম লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন ছাড়া তিনি আর কিছুই পাননি। আদ্দাস নামক একজন খৃস্টান ক্রীতদাস ছাড়া কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

বহিরাগতদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

প্রতি বছর হাজ হতো মাক্কায়। আরবের সব অঞ্চল থেকে লোক আসতো সেখানে।

আবার বিভিন্ন মওসুমে মেলা বসতো নানাস্থানে। সেই গুলোতেও আসতো অনেক

লোক। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের মাঝে ছুটে যেতেন। লোকদেরকে আল কুরআনের বাণী শুনাতেন। কারো কারো অন্তরে সত্যের আলো জ্বলে উঠতো।

তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজের এলাকায় ফিরে যেতো। এইভাবে ইসলামের আহ্বান মাক্কার বাইরে পৌছতে থাকে।

একদল জিনের ইসলাম গ্রহণ

উকাজের মেলা।

বহু লোক জমায়েত হয়েছে সেখানে। মুহাম্মাদ (সা) ছুটে গেলেন ইসলামের আহ্বান পৌঁছাতে। পথের একটি স্থান নাখলা। রাত কাটালেন তিনি সেখানে। ছালাতুল ফাজর্ আদায় করলেন সংগের কয়েকজন মুসলিমকে নিয়ে।

তিনি ছালাতে আল কুরআন পড়ছিলেন।

একদল জিন থমকে দাঁড়ায়। সত্য দ্বীনের সাথে তারা পরিচিত হয়।

আল্লাহ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে ছিলো। আল কুরআনের জ্ঞান তাদেরকে সেই বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করে। এই জিনেরা অন্যান্য জিনদের কাছে গিয়ে দীন সম্পর্কে যেই আলাপ-আলোচনা করে আল কুরআনে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۙ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

"আমরা বিস্ময়কর এক কুরআন শুনেছি যা নির্ভুল পথের দিশা দেয়। আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর আমরা আর কখনো আমাদের অদ্বিতীয় রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা আল-জিন ঃ ১-২)

এইভাবে ইসলামের দাওয়াত জিনদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।

চাঁদ বিদারণ

ইসলাম প্রচারের অষ্টম বছরের ঘটনা। মুহাম্মাদ (সা) একদিন মিনাতে ছিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো আসমানে। হঠাৎ তা দুই টুকরা হয়ে গেলো। পাহাড়ের দুই পাশে দেখা গেলো দুইটি অংশ।

ক্ষণিকের মধ্যেই আবার অংশ দুইটি একত্রিত হয়ে গেলো। বেশ কিছু সংখ্যক মুশরিক উপস্থিত ছিলো সেখানে। তারা ব্যাপারটাকে যাদুর খেল বলে উড়িয়ে দিলো। রাসূলের (সা) সাথে একদল মুসলিমও ছিলেন উপস্থিত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), হুজায়ফা (রা) এবং জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত।

এই ঘটনার মাধ্যমে কাফিরদের বুঝাবার চেষ্টা করা হলো যে চাঁদ যেই ভাবে দুই টুকরা হয়ে গেলো এইভাবে বিশ্ব জাহানের সব কিছুই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

এই ঘটনার পর আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

"কিয়ামতের সময় নিকটে এসে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে।" (সূরা আল-কামার ঃ ১)

ইয়াসরিবে ইসলাম

ইসলাম প্রচারের দশম বছর। হাজ উপলক্ষে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এসেছে মাক্কায়। ইয়াসরিব থেকেও এসেছে একদল লোক।

মুহাম্মাদ (সা) মিনার আকাবা নামক স্থানে ইয়াসরিববাসীদের সাথে মিলিত হন। তাদের নিকট তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। ছয়জন ইয়াসরিববাসী সেখানে ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াসরিবে ফেরেন।

ইসলাম প্রচারের একাদশ বছর।

ইয়াসরিব থেকে হাজে এলো আরো বারোজন লোক। তারা আকাবায় রাসূলের (সা) সংগে মিলিত হন। ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন-

(১) আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করবো না।

(২) চুরি করবো না।

(৩) যিনা করবো না।

(৪) সন্তান হত্যা করবো না।

(৫) মিথ্যা অপবাদ দেবো না ও গীবত করবো না।

(৬) রাসূলুল্লাহ (সা) যেই সব নির্দেশ দেবেন, সেইগুলো অমান্য করবো না।

এই শপথ গ্রহণ করাকেই বলা হয় প্রথম বাইয়াতে আকাবা।

এই নও মুসলিমদেরকে ইসলামের প্রশিক্ষণ দানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মুসয়াব ইবনু উমাইরকে (রা) ইয়াসরিবে পাঠান।

ইসলাম প্রচারের দ্বাদশ বছর।

ইয়াসরিব থেকে হাজে এলো ৭৫ জন লোক। পূর্ববর্তীদের মতোই তারা আকাবা নামক স্থানে গোপনে আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে মিলিত হন। পূর্ববর্তীদের মতোই রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে ৬টি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। একে বলা হয় দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা।

ইয়াসরিবে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটাবার জন্যে আল্লাহর রাসূল বারোজন ব্যক্তিকে নাকীব নিযুক্ত করেন।

তাঁরা হচ্ছেন,

উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা), আবুল হাইছাম ইবনু তাইয়িহান (রা), সা'দ ইবনু খাইছামা (রা), আসয়াদ ইবনু যুরারাহ (রা), সা'দ ইবনু যুরারাহ (রা), আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা), মুনযির ইবনু আমর (রা), বারা ইবনু মারূর (রা), আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা), উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) ও রাফে ইবনু মালিক (রা)।

ইয়াসরিবের আমন্ত্রণ

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) ইয়াসরিবে স্থানান্তরিত হবার আমন্ত্রণ জানান।

এই সময় সা'দ ইবনু যুরারাহ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন,

"ভাইসব, তোমরা কি জান কি কথার উপর তোমরা আজ শপথ নিয়েছো? জেনে নাও, এ হচ্ছে সমগ্র আরব ও অনারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।"

ইয়াসরিববাসী সকল মুসলিম ঘোষণা করলেন, "আমরা সব কিছু বুঝে শুনেই শপথ নিয়েছি।"

অতঃপর স্থির হলো, মুহাম্মাদ (সা) ইয়াসরিবে হিজরাত করলে সেখানকার মুসলিমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে তাঁর সহযোগিতা করবেন।

মি'রাজ বা ঊর্ধ্বে গমন

ইসলাম প্রচারের দ্বাদশ বছর।

২৬শে রজবের দিবাগত রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়। জিবরাইল (আ) বুরাকে চড়িয়ে মুহাম্মাদকে (সা) মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ (সা) দু'রাকাআত ছালাত আদায় করেন।

এরপর শুরু হলো আকাশ ভ্রমণ। বিভিন্ন আকাশে অতীতের নবীদের সঙ্গে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ ঘটে।

আল্লাহর রাসূল (সা) জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণকালেই উম্মাহর জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ও পরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফারয করা হয়।

মি'রাজের সত্যতা ঘোষণা করে নাযিল হয় সূরা বানী ইসরাঈল। এই সূরাতে ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে নীতিমালা পরিবেশিত হয়।

সে নীতিমালা হচ্ছে ঃ

❖ আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না।

❖ আব্বা-আম্মার প্রতি সদাচরণ করবে।

❖ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন ও মুসাফিরের হক আদায় করবে।

❖ অপচয় ও অপব্যয় করবে না।

❖ মিতব্যয়ী হবে।

❖ অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না।

❖ যিনার নিকটবর্তী হবে না।

❖ কাউকে হত্যা করবে না।

❖ ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।

❖ ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

❖ মাপ ও ওজনে ফাঁকি দেবে না।

❖ যেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই (গুজব) তার পেছনে ছুটবে না।

❖ গর্বভরে চলাফেরা করবে না।

রাসূলকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র

ইসলাম প্রচারের ত্রয়োদশ বছর।

মুশরিকদের অত্যাচার চরমে উঠে। মুসলিমরা গোপনে একে একে ইয়াসরিবে হিজরাত করেন। কয়েকজন অক্ষম মুসলিম মাক্কায় রয়ে গেলেন। রাসূলের (সা) সাথে থেকে গেলেন আবু বাকর (রা) ও আলী (রা)।

মুসলিমরা ইয়াসরিবে গিয়ে নিরাপদ হচ্ছে। শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থা দেখে মুশরিকরা মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। দারুন নাদওয়া ছিলো কুরাইশদের মিলনায়তন। মুশরিকরা সেখানে মিলিত হয়।

অনেক সলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হয় যে মুহাম্মাদকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। গোত্রীয় বিবাদ এড়ানোর জন্যে স্থির হয় যে প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবক অংশ নেবে ও মিলিতভাবে মুহাম্মাদের (সা) উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। এই কাজের জন্য একটি রাতও নির্দিষ্ট করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে সেই রাতে সকলে গিয়ে মুহাম্মাদের (সা) বাসগৃহ ঘেরাও করবে এবং ভোরবেলা তিনি যখন ঘর থেকে বেরোবেন তখন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে হিজরাত করার নির্দেশ পান।

ইয়াসরিবের পথে

ইসলাম প্রচারের ত্রয়োদশ বছর।

নির্দিষ্ট রাতে ১২ জন যুবক রাসূলের (সা) বাসগৃহ ঘেরাও করে। আল্লাহর রাসূল (সা)

فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৯)

আয়াতটি বার বার পড়ছিলেন। আল্লাহর কুদরাতে দুশমনদের তন্দ্রাভাব এসে যায়। আল্লাহর নবী (সা) তাদের সম্মুখ দিয়ে ধীর পদে বেরিয়ে মাক্কার নিকটবর্তী সাওর পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেন। ভোরবেলা মুশরিকগণ টের পেলো

মুহাম্মাদ (সা) ঘরে নেই। সকলে চিন্তায় পড়ে গেলো। মাক্কার চারদিকে লোক পাঠানো হলো।

সাওর পাহাড়ের গুহার নিকটেও সন্ধানীরা এসে পড়ে। রাসূলের (সা) নিরাপত্তার কথা ভেবে আবুবাকর (রা) অস্থির হয়ে পড়েন। আল্লাহর রাসূল (সা) বলে উঠেন- لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"ঘাবড়াবেনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৪০)

গুহার মুখে কবুতরের বাসা ও মাকড়সার জাল দেখে মুশরিকরা গুহার দিকে অগ্রসর হয়নি। আল্লাহর রাসূল (সা) তিন দিন এই গুহাতে অবস্থান করেন। চতুর্থ দিনে তিনি ইয়াসরিবের দিকে রওয়ানা হন। তবে তিনি সচরাচর ব্যবহৃত পথ না ধরে ভিন্নপথে অগ্রসর হন।

কুবায় মুহাম্মাদ (সা)

ইয়াসরিব থেকে তিন মাইল দূরে কুবা পল্লী। ইয়াসরিববাসীদের কিছু পরিবার এখানে বসবাস করতো। আল্লাহর রাসূল (সা) কুবায় এসে পৌঁছেন। তিনি কুলসুম ইবনুল হিদমের মেহমান হন। এখানে তিনি একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধ কুবা মাসজিদ।

ইয়াসরিবে মুহাম্মাদ (সা)

দুই সপ্তাহ কুবাতে থাকার পর আল্লাহর রাসূল (সা) ইয়াসরিবের দিকে অগ্রসর হন।

ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে আনন্দ। ছোট-বড়ো সবাই জড়ো হয়েছে পথে। উটে চড়ে মুহাম্মাদ (সা) এলেন ইয়াসরিবে-

মেয়েরা ঘরের ছাদে উঠে গেয়ে চললো-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعٰى لِلّٰهِ دَاعٍ.

"পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে আমাদের উপর
বিদা পাহাড়ের চূড়া থেকে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব

আহ্বানকারীর আল্লাহর প্রতি আহ্বানের বিনিময়ে।"

তাঁকে মেহমান হিসেবে পেতে চাইলেন সবাই। তিনি কার আবদার রক্ষা করবেন, এ ছিলো এক সমস্যা। তিনি জানালেন, তাঁর উট যেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সেই ঘরে তিনি উঠবেন।

অবশেষে উট গিয়ে দাঁড়ালো এক ঘরের সামনে।

সৌভাগ্য অর্জন করলেন ঘরের মালিক। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নাম আবু আইউব খালিদ আল আনসারী (রা)।

নবীকে (সা) পেয়ে ইয়াসরিববাসীরা আনন্দে আত্মহারা। তিনি হলেন তাঁদের সবচেয়ে বেশী প্রিয়জন।

তাঁরা তাঁদের শহরের নাম পরিবর্তন করলেন। ইয়াসরিবের নাম হলো মাদীনা।

মাদীনার মাসজিদ

আল্লাহর রাসূল (সা) একটি মাসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

এই উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি কেনা হয়।

কাঁচা ইটের দেয়াল তৈরি হলো।

খেজুর গাছের খুঁটির উপর তৈরি হলো খেজুর পাতার ছাদ।

প্রথমে মেঝে ছিলো কাঁচা।

কিছুকাল পর পাথর বিছিয়ে মেঝে পাকা করে নেয়া হয়।

এই মাসজিদ নির্মাণ কাজে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে রাসূল (সা) অংশ নেন। তিনিও ইট পাথর বহন করেন।

এই মাসজিদটি মাসজিদে নববী নামে প্রসিদ্ধ।

রাসূলের (সা) বাসগৃহ

মুহাম্মাদ (সা) আবু আইউব খালিদ আল আনসারীর (রা) বাড়িতে ছিলেন সাত মাস।

অতঃপর মাসজিদে নববীর পাশে তাঁর জন্য একটি কক্ষ তৈরি হলে তিনি তাতে বসবাস করতে থাকেন।

মাসজিদের গা ঘেঁষে আল্লাহর রাসূলের (সা) স্ত্রীদের বাসগৃহ তৈরি হয়। এই ঘরগুলো ছয়-সাত হাত চওড়া ও দশ হাত লম্বা ছিলো। ছাদ ছিলো খুবই নীচু। দরজায় কম্বলের পর্দা ঝুলানো থাকতো।

মাদীনার সনদ

মাদীনার ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি মাদীনার সনদ নামে খ্যাত। এই সনদে লিখা ছিলো–

মুসলিম ও ইয়াহুদীগণ এক রাষ্ট্র জাতিতে পরিণত হবে।

হত্যার বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে অর্থদান প্রথা বহাল থাকবে।

ইয়াহুদীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।

ইয়াহুদী বা মুসলিম কেউ কুরাইশ শত্রুকে আশ্রয় দেবে না।

মাদীনা আক্রান্ত হলে সবাই মিলে মাদীনা রক্ষা করবে।

কোন সম্প্রদায় শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করলে অন্য সম্প্রদায়ও করবে।

ধর্ম যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

মাদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাদের ভবিষ্যৎ বিবাদ নিষ্পত্তির ভার মুহাম্মাদের (সা) উপর অর্পণ করবে।

এই সনদই ছিলো মাদীনা রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান।

মুহাম্মাদ (সা) হলেন মাদীনা রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র প্রধান।

কিবলা পরিবর্তন

হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাস।

মুসলিমদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা)।

মাসজিদুল আকসা তখনো মুসলিমদের কিবলা।

ছালাতের মধ্যেই নির্দেশ এলো ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৪)

সংগে সংগে আল্লাহর রাসূল (সা) পুরো জামায়াত নিয়ে কা'বামুখী হয়ে ছালাতের বাকী অংশ আদায় করেন।

কিবলা পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে মাদীনার একাংশে দাঁড়িয়ে আছে মাসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মাসজিদ।

রামাদানে ছাওম বা রোযা পালন

আল্লাহর রাসূল (সা) মাক্কায় থাকাকালেই প্রতি মাসে তিন দিন ছাওম পালন করতেন।

মুমিনের নৈতিক ট্রেনিংয়ের অন্যতম প্রধান উপায় রোযা পালন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে পুরো রামাদান মাসে ছাওম বা রোযা পালনের নির্দেশ আসে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"মুমিনগণ, তোমাদের জন্য রোযাকে ফার্‌য করে দেয়া হলো যেমন করে ফার্‌য করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩)

এই বছর থেকে মুসলিম উম্মাহ্ রামাদান মাসে ছাওম পালন করতে থাকে।

এই বছরই ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়।

জামায়াতের সাথে ঈদুল ফিতরের ছালাত এই বছরই শুরু হয়।

বদর যুদ্ধ

হিজরী দ্বিতীয় সন। রামাদান মাস।

এক হাজার সুসজ্জিত যোদ্ধা নিয়ে মাক্কার কুরাইশরা মাদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়।

সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা) মুকাবিলার প্রস্তুতি নেন।

তিন শত তের জনের একটি বাহিনী তৈরি হয়।

এই বাহিনী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মাদীনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। এই প্রান্তরের নাম বদর।

প্রচণ্ড লড়াই হয়।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে ৩১৩ জন মুসলিম এক হাজার মুশরিক যোদ্ধাকে পরাজিত করেন।

মুশরিক সরদারদের মধ্যে শাইবা, উৎবা, আবু জাহাল, জাময়াহ, আ'স, উমাইয়া নিহত হয়। সত্তর জন মুশরিক নিহত হয়। আরো সত্তর জন হয় বন্দী।

চৌদ্দজন মুসলিম শহীদ হন।

বদর প্রান্তরে মুসলিমদের এই বিজয় ইসলামের গৌরব বাড়িয়ে তোলে। বদরের বিজয়ের পর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের প্রশিক্ষণের জন্যে দীর্ঘ বাণী নাযিল করেন। তার একাংশে বলা হয়–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ج وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"হে মুমিনগণ, কোন বাহিনীর সংগে যখন তোমাদের মুকাবিলা হয় তখন দৃঢ়পদ থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং মতবিরোধ করো না, অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে ও তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ছবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছবর অবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।" (সূরা আল আনফাল ঃ ৪৫-৪৬)

বনু কাইনুকার বিরুদ্ধে অভিযান

বানু কাইনুকা ছিলো একটি ইয়াহুদী গোত্র।

মাদীনা সনদের আওতায় তারা ছিলো মাদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক।

নির্বিবাদে তারা মাদীনায় বসবাস করছিলো।

দ্বিতীয় হিজরী সনের রামাদান মাসে বদর প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী প্রথম সামরিক বিজয় লাভ করে।

মুসলিমদের এই বিজয় ইয়াহুদীদেরকে শংকিত করে তোলে। তারা গোড়াতেই এই শক্তিকে বিনষ্ট করার চক্রান্তে মেতে উঠে। কিন্তু মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকার কারণে তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না।

একদিন এক ইয়াহুদী একজন মুসলিম মহিলার শ্লীলতা হানি করে।

মহিলার ক্রুদ্ধ স্বামী উক্ত ইয়াহুদীকে হত্যা করে বসে। আল্লাহর রাসূল (সা) বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু বানু কাইনুকার ইয়াহুদীরা এই ঘটনাকে বাহানা বানিয়ে এক তরফাভাবে চুক্তি বাতিল করে দেয়। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তাদের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করে।

মুসলিমগণ দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ পনর দিন স্থায়ী হয়। ইয়াহুদীরা বুঝতে পারে যে মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়ে যাওয়া বৃথা।

তারা মাদীনা ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের সেই প্রার্থনা মনজুর করেন। দুর্গ থেকে বেরিয়ে বানু কাইনুকা সিরিয়ার দিকে চলে যায়। এটা ছিলো দ্বিতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ঘটনা।

উহুদ যুদ্ধ

হিজরী তৃতীয় সন। শাওয়াল মাস।

কুরাইশ মুশরিকরা বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মাদীনার দিকে অগ্রসর হয়।

মাদীনার প্রায় চার মাইল দূরে উহুদ পাহাড়। কুরাইশ বাহিনী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাউনী ফেলে।

তাদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিলো তিন হাজার।

কুরাইশ মুশরিক বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য রাসূলের (সা) নেতৃত্বে এক হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী উহুদের দিকে রওয়ানা হয়।

পথিমধ্যে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তার অনুগত তিন শত লোক নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে সরে পড়ে।

মাত্র সাত শত যোদ্ধা নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) তিন হাজার যোদ্ধার সম্মুখীন হন।

এই অসম যুদ্ধে মুসলিমরা বীর বিক্রমে লড়াই করেন।

সত্তর জন মুসলিম শহীদ হন।

আল্লাহর রাসূলও (সা) গুরুতর আহত হন। এই যুদ্ধে কারোই চূড়ান্ত বিজয় হয়নি। তবে কুরাইশরা মাদীনায় প্রবেশ না করেই ফিরে যায়।

উহুদের যুদ্ধের পর মুমিনদের প্রশিক্ষণের জন্যে আল্লাহ যেই বাণী পাঠান তার একাংশে বলা হয়,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ط وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

"মন ভাংগা হয়ো না, চিন্তা ক্লিষ্ট হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও। এখন যদি তোমাদের উপর কোন আঘাত এসে থাকে, ইতোপূর্বে অন্য দলের উপরও অনুরূপ আঘাত এসেছে। এটা তো কালের পরিবর্তন যা আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি।

এটা এজন্য এসেছে যে আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে কারা খাঁটি মুমিন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ তিনি গ্রহণ করতে চান। যালিমদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি মুমিনদেরকে আলাদা করে কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চান। তোমরা কি ভেবেছো যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি যে তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে যারা আল্লাহর পথে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং কারা ছবর অবলম্বনকারী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯-১৪২)

উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন

উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন। ফলে তাদের পরিত্যক্ত জমিজমা ও অন্যান্য সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে ইসলামের পথ নির্দেশ জানার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সেই সময়টিতে আল্লাহ উত্তরাধিকার আইন নাযিল করেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ.

"তোমাদের সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ এই বিধান দিচ্ছেন–

পুরুষের অংশ দুইজন মেয়েলোকের সমান হবে। যদি দুইজনের অধিক কন্যা হয় তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে।

আর একজন কন্যা হলে তার জন্য অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার আব্বা-আম্মা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠ অংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং আব্বা-আম্মাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে আম্মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের এক ভাগ। আর মৃত ব্যক্তির যদি ভাই-বোন থাকে তবে আম্মা ষষ্ঠ ভাগের হকদার হবে। এইসব অংশ বণ্টন করে দেয়া হবে মৃতের ওয়াসিয়াত পূর্ণ করা ও তার সব ঋণ আদায় করার পর।" (সূরা আন নিসা ঃ ১১)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

"আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের ওয়াসিয়াত পূরণ করা হবে ও তাদের ঋণ আদায় করে দেয়া হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। তাও কার্যকর হবে যখন তোমাদের ওয়াসিয়াত পূর্ণ করা হবে ও যেই ঋণ তোমরা রেখে গেছো তা আদায় করা হবে।

সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার আব্বা-আম্মা যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন এর বেশী হয় তাহলে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে তারা সকলে শরীক হবে তখন যখন ওয়াসিয়াত পূরণ করা হবে ও মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় করে দেয়া হবে। অবশ্য শর্ত এই যে তা যেন ক্ষতিকর না হয়। এই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও পরম ধৈর্যশীল।" (সূরা আন নিসা ঃ ১২)

আল্লাহর রাসূল (সা) মাদীনা রাষ্ট্রে এই উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করেন।

বানু নুদাইরের বিরুদ্ধে অভিযান

ইয়াহুদীদের আরেকটি গোত্র ছিলো বানু নুদাইর।

এরা চুক্তি শর্ত উপেক্ষা করে মাক্কার মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। তারা রাসূলকে (সা) গোপনে হত্যা করার চেষ্টাও করে কয়েকবার। তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নেয়।

প্রচুর রসদ নিয়ে ঢুকে ছিলো তারা দুর্গে।

১৫৫ দিন তারা অবরুদ্ধ ছিলো।

অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়। এই মর্মে সন্ধি হয় যে উটের পিঠে চাপিয়ে যেই পরিমাণ সম্পদ নেয়া যায় তা নিয়ে তারা মাদীনা ছেড়ে চলে যাবে।

বানী নুদাইর মাদীনা ছেড়ে খাইবার এসে অন্যান্য ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়।

আহযাব যুদ্ধ

খাইবারে বসে ইয়াহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। তারা নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

তাদের প্রতিনিধিদল মাক্কায় গিয়ে মুশরিকদেরকে যুদ্ধের উস্কানি দেয়।

অবশেষে ইয়াহুদী ও কুরাইশদের প্রচেষ্টায় দশ হাজার লোকের একটি বিরাট বাহিনী গঠিত হয়।

যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পৌঁছে মাদীনায়।

আল্লাহর রাসূল (সা) এবার মাদীনাতে থেকেই শত্রুর মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় বসেন যুদ্ধ বিশারদরা। সিদ্ধান্ত হলো শত্রুর গতিরোধ করার জন্যে শহরের বাইরে গভীর ও প্রশস্ত খাল কাটা হবে।

মাদীনার খোলা দিকটায় খাল খনন শুরু হয়। তিন হাজার মুসলিম খাল খনন কাজে অংশ নেন। আল্লাহর রাসূলও (সা) এতে অংশ নেন। পাঁচ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ গভীর খালটি তৈরি হলো বিশ দিনে। দশ হাজার শত্রুসেনা তিন দিক থেকে মাদীনা আক্রমণ করে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন মুসলিমরা। প্রধানতঃ তীরের লড়াই চলতে থাকে।

খাল পার হবার বহু চেষ্টা করেছে শত্রুসেনারা। মুসলিম তীরন্দাজরা তাদের সব চেষ্টা প্রতিহত করেন। মুসলিমদের রসদ ছিলো সীমিত। খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত তাঁরা বড্ড একটা পাননি। প্রায় একমাস স্থায়ী হয় অবরোধ।

একদিন প্রচণ্ড ঝড় নামে। ঝড়ে কাফিরদের ছাউনী উড়ে যায়। যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহুদীরা আগেই কেটে পড়েছিলো। বাকী ছিল কুরাইশরা। তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অবরোধ তুলে নিয়ে মাক্কার দিকে রওয়ানা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।

এটি হিজরী পঞ্চম সনের ঘটনা।

এই যুদ্ধের পর মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ যেই বাণী নাযিল করেন তার একাংশে বলা হয়–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا.

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন তোমাদের উপর মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং আমি তাদের উপর প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিলাম ও এমন সৈন্য পাঠালাম যা তোমরা দেখতে পাওনি।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৯)

বানু কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান

বানু নুদাইর মাদীনা থেকে চলে যাবার কালে বানু কুরাইজার ইয়াহুদীরা নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মাদীনায় থাকাই পছন্দ করে। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে সেই সুযোগ দেন।

আহযাব যুদ্ধের সময় বাইরের ইয়াহুদী গোত্রগুলোর পরামর্শে বানু কুরাইজা কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কোন তোয়াক্কাই করলো না।

আহযাব যুদ্ধ শেষে এই বিশ্বাসঘাতকদেরকে শায়েস্তা করার জন্য মুসলিমরা বানু কুরাইজার দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ প্রায় একমাস স্থায়ী হয়। অবশেষে মুসলিমরা ইয়াহুদীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাংগতে সক্ষম হন। এই গোত্রের অপরাধী যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হয় ও বাকীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

এইভাবে ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহুদী চক্র খতম হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরী ষষ্ঠ সন।

আল্লাহর রাসূল (সা) কা'বা যিয়ারতের সিদ্ধান্ত নেন। চৌদ্দশত মুসলিম রাসূলের (সা) সংগী হন। মুসলিমদের কোন সামরিক উদ্দেশ্য ছিলো না। প্রত্যেকের সংগে ছিলো মাত্র একখানি কোষবদ্ধ তলোয়ার। আল্লাহর রাসূল (সা) হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে পৌছেন। এদিকে কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর তাঁর কাছে আসতে থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বুঝানো হলো যে কা'বা যিয়ারাত ছাড়া তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদেরকে মাক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজি হলো না।

আল্লাহর রাসূল (সা) উসমান ইবনু আফফানকে (রা) দূত রূপে কুরাইশদের নিকট পাঠান। কুরাইশরা তাঁকে আটক করে রাখে। এই দিকে উসমান (রা) শহীদ হয়েছেন বলে মুসলিমদের নিকট খবর আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বাবলা গাছের নীচে বসে সকলের নিকট থেকে এই শপথ নেন, "আমরা শেষ হয়ে যাবো, কিন্তু লড়াই থেকে পিছু হটবো না"।

এই শপথেরই নাম বাইয়াতে রিদওয়ান।

মুসলিমদের এই শপথের কথা কুরাইশদের নিকট পৌছলো। উসমান (রা) নিরাপদে ফিরে এলেন। কুরাইশদের দূত সুহাইল ইবনু আমর এলো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর চুক্তির শর্তগুলো ঠিক হলো ঃ

(১) মুসলিমগণ এই বছর ফিরে যাবে।

(২) তারা আগামী বছর আসবে, কিন্তু মাত্র তিন দিন থাকবে।

(৩) কোষবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে আসবে, অন্য কোন অস্ত্র আনবে না।

(৪) মাক্কায় যেই সব মুসলিম এখনো অবস্থান করছে তাদেরকে সংগে নিতে পারবে না এবং কোন মুসলিম মাক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

(৫) মাক্কা থেকে কেউ মাদীনায় গেলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে; কিন্তু কোন মুসলিম মাক্কায় চলে গেলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না।

(৬) আরবের গোত্রগুলো মুসলিম বা কুরাইশ যেই কোন পক্ষের সাথে সন্ধি করতে পারবে।

(৭) এই সন্ধি চুক্তি দশ বছর কাল বহাল থাকবে।

দৃশ্যতঃ চুক্তির শর্তগুলো মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী। মুসলিমরা এই চুক্তিকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। আল্লাহর রাসূল (সা) এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। আর প্রজ্ঞাময় আল্লাহ একেই বলেছেন 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয়। এই চুক্তির ফলে মুসলিম শক্তি স্বীকৃতি পায়। এই সন্ধির ফলে যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়। পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামের দাওয়াত পরিবেশনের শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাসূল (সা) মুসলিমদের প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ লাভ করেন। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানের সুযোগ পান। আরবের বাইরে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ লাভ করেন।

শান্ত পরিবেশে মুসলিমরা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন এবং মাত্র দুই বছরের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের মতো বেশ কিছু সেরা ব্যক্তিত্ব এই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতী চিঠি

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে আল্লাহর রাসূল (সা) লিখেন–

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসক হিরাক্লিয়াসের নামে। যেই ব্যক্তি সত্যপথ অনুসরণ করে তার প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর আনুগত্য কবুল কর, তুমি শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুন প্রতিফল দেবেন। তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও- তাহলে তোমার অধীন ব্যক্তিদের গুনাহর জন্য তুমি দায়ী হবে।

হে আহলি কিতাব, আস এমন একটি কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সংগে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে

প্রভু বানাবো না। তোমরা যদি এ কথা মানতে অস্বীকার কর, তাহলে সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।"

ইরান সম্রাট খসরু পারভেজকে আল্লাহর রাসূল লিখেন−

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের শাসকের নিকট।

যেই ব্যক্তি সত্যপথ অনুসরণ করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর প্রেরিত যাতে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারি। তুমি আল্লাহর আনুগত্য কবুল কর। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে। তা না হলে আগুন পূজারীদের গুনাহর জন্য তুমি দায়ী থাকবে।"

এভাবে মিসর, বাসরা, দামেস্ক, বাহরাইন, ওমান প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকদের নিকট আল্লাহর রাসূল (সা) চিঠি লিখে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সামাজিক আচরণ শিক্ষাদান

হিজরী ষষ্ঠ সনে সামাজিক আচরণ বিধি হিসেবে যেসব বাণী নাযিল হয় তার একাংশ নিম্নরূপ ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا
فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا
فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না ঘরের লোকদের অনুমতি পাবে ও তাদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমরা তা স্মরণ রাখ। সেখানে যদি কাউকে না পাও তবে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না

তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর তোমাদেরকে যদি বলা হয়, "ফিরে যাও" তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্র কর্মনীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেই সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।" (সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৮)

ব্যভিচারের শাস্তি বিধান

হিজরী ষষ্ঠ সন।

ইসলামী রাষ্ট্র তখন অনেক সুসংহত। পাপ ও অশ্লীলতার দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পরিবেশ এখন পবিত্র। এই পবিত্র পরিবেশ বিনাশ করতে পারে এমন কিছুকে আর প্রশ্রয় দেয়া যায় না। এই সময় আল্লাহ ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নাযিল করেন-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"যিনাকার মেয়েলোক ও যিনাকার পুরুষ– প্রত্যেককে একশতটি কোড়া মার। তোমরা যদি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণকারী হও আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন দয়ার ভাব সৃষ্টি না হয়। আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।" (সূরা আন নূর ঃ ২)

অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনায় লিপ্ত হলে এই দণ্ডবিধান। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনায় লিপ্ত হলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হয়। একেই বলা হয় 'রজম'।

পর্দার বিধান

হিজরী ষষ্ঠ সনের প্রথম ভাগ।

সামাজিক আচরণ, ব্যভিচারের শাস্তি বিধান সংক্রান্ত বাণীর সঙ্গেই নাযিল হয় পর্দার বিধান।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ
نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ.

“এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায় কেবল সেটুকু ছাড়া যা আপনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের উপর যেন ওড়নার একাংশ টেনে দেয়।

তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায়, কেবল এই লোকদের সামনে ব্যতীত– তাদের স্বামী, তাদের আব্বা, তাদের স্বামীর পিতা, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইদের পুত্র, তাদের বোনদের পুত্র, তাদের সংগী স্ত্রীলোক, তাদের দাসী, অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরজ নেই এবং সে সব বালক যারা স্ত্রীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি।

তারা যমীনে এভাবে পা মেরে চলবে না যাতে যেই সৌন্দর্য লুকিয়ে রেখেছে তা লোকেরা জানতে পারে।” (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

এই বিধান মুতাবিক একজন নারীর জন্যে আপন চাচাতো ভাই, জ্যেঠাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই, স্বামীর ভাই, স্বামীর চাচা-জ্যেঠা, স্বামীর ভাগিনা, স্বামীর ভাতিজা, নিজ ছেলে বা মেয়ের শ্বশুর, নিজ ছেলে বা মেয়ের শ্বশুরের ছেলে, স্বামীর মামা, স্বামীর ফুফা, স্বামীর খালু, বোনের স্বামী প্রমুখের সাথে পর্দা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান

হিজরী ষষ্ঠ সনে মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটনা করে। অবিরাম প্রচার অভিযান চালিয়ে তারা মাদীনার পরিবেশ বিষাক্ত করে তোলে। মুনাফিকদের চক্রান্তে মাদীনার পবিত্র পরিবেশ বিষাক্ত হবার উপক্রম। আল্লাহর রাসূল (সা) অস্থির হয়ে উঠেন। এই সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব বাণী নাযিল করেন তার একাংশ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔

"যারা সচ্চরিত্র নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে অথচ অন্ততঃ চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে আশি কোড়া মার। অতঃপর এদের সাক্ষ্য আর কোনদিন গ্রহণ করো না।" (সূরা আন নূর ঃ ৪)

আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক রাসূলুল্লাহ (সা) পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরিবেশ আবার সুস্থ হয়ে উঠে। মুনাফিকদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

চুরির শাস্তি বিধান

হিজরী সপ্তম সনের প্রথম ভাগ।

ইতোমধ্যে মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে। প্রতিটি মানুষই খুঁজে পায় তার বেঁচে থাকার অধিকার। নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করার পর ইসলামী রাষ্ট্র অপরাধ প্রবণতা দমনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চুরির প্রবণতা প্রতিরোধের জন্যে এই অপরাধের শাস্তি বিধান করে আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔

"চোর পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর নিকট থেকে শিক্ষামূলক শাস্তিবিশেষ। আর আল্লাহ সর্বজয়ী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩৮)

রাসূলের (সা) শাসনকালে একটি ঢালের দামের চেয়ে কম দামের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হতো না। সেই যুগে একটি ঢালের দাম ছিলো দশ দিরহাম।

হারাম খাদ্য চিহ্নিতকরণ

হিজরী সপ্তম সন।

হারাম-হালালকে সুনির্দিষ্ট করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন বাণী নাযিল করেন-

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

"তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তুগুলোকে হালাল করা হয়েছে সেই সব বাদে যা একটু পরেই জানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ইহরামের অবস্থায় শিকার কাজকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তারই আদেশ দান করেন।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ১)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ.

"তোমাদের জন্য হারাম মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত ও সেই সব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত খেয়ে, উপর হতে পড়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মারা গেছে বা যাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করেছে– যা জীবিত পেয়ে জবাই করা হয়েছে তা ব্যতীত এবং যা কোন আস্তানায় (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নযর-নিয়াজের জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানে) জবাই করা হয়েছে। সেই সংগে পাশা খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেয়াও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এই সব কাজ ফিসক।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা খেলা- এই সবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা এই সব পরিহার কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৯০)

পরবর্তীকালে আরো যেসব জন্তু-জানোয়ার খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নখরধারী পাখি, মৃত ভক্ষণকারী প্রাণী, যাবতীয় হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, গাধা ও খচ্চর।

খাইবার যুদ্ধ

হিজরী সপ্তম সন।

মুহাররাম মাস।

রাসূল (সা) এবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র খাইবারের দিকে দৃষ্টি দেন। ষোল শত যোদ্ধা নিয়ে তিনি খাইবার এসে পৌঁছেন। খাইবারে ছিলো ৬টি দুর্গ। এই সব দুর্গ ছিলো ২০ হাজার ইয়াহুদী যোদ্ধা। ইয়াহুদীরা কোনরূপ সন্ধি করতে রাজি হলো না। মুসলিম বাহিনী দুর্গগুলো অবরোধ করে। মাঝে-মধ্যে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিশদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অবশেষে আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধে ৯৩ জন ইয়াহুদী নিহত হয়। ১৫ জন মুসলিম শহীদ হন। খাইবারের জমি মুসলিমদের দখলে আসে। ইয়াহুদীরা ফসলের অর্ধাংশ প্রদান করার শর্তে এই সব জমি চাষাবাদের অধিকার প্রার্থনা করে। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের এই প্রার্থনা মনজুর করেন।

উমরাহ্ পালন

হিজরী সপ্তম সন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত মুতাবিক আল্লাহর রাসূল (সা) উমরাহর জন্য মাক্কায় আসেন। সংগে আসেন মুসলিমদের বিরাট দল। তাঁরা তিনদিন মাক্কায় থাকেন। নির্বিঘ্নে ওমরাহ উদ্‌যাপন করেন। তাঁদের চরিত্র ও আচরণ দেখে অনেকেই

অবাক হয়। মুসলিমদেরকে কা'বা তাওয়াফ করতে দেখে মুশরিকরা হিংসার আগুনে পুড়তে থাকে।

হুদাইবিয়ার চুক্তি তাদের অনুকূল হয়েছে ভেবে তারা খুব উৎফুল্ল ছিলো। এখন সেই চুক্তি তাদের নিকট অর্থহীন মনে হতে লাগলো। যথারীতি উমরাহ পালন করে রাসূল (সা) মাদীনায় ফিরে আসেন। এই উমরাহকেই 'উমরাতুল কাযা' বলা হয়।

মাক্কা বিজয়

মুসলিমদের মিত্র গোত্র বানু খুজায়ার লোকদের হত্যাকাণ্ডে কুরাইশরা অংশ নেয়। এমনকি কা'বা ঘরে আশ্রয় নিয়েও বানু খুজায়ার কোন লোক প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। এইভাবে কুরাইশরা হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করে। আল্লাহর রাসূল (সা) এবার মুশরিক কুরাইশদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

হিজরী অষ্টম সন।

রামাদান মাস।

দশ হাজার মুসলিম নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) মাক্কার দিকে রওয়ানা হন। রাসূল (সা) মাক্কার নিকটে এসে ছাউনী ফেলেন। মুসলিম সেনাদের শক্তি-সামর্থ্য আন্দাজ করার জন্য কুরাইশ সরদার আবু সুফইয়ান গোপনে সেই ছাউনীর কাছে আসেন। মুসলিম প্রহরীগণ তাঁকে গ্রেফতার করে রাসূলের সামনে নিয়ে আসে। ইসলামের দুশমনদের মধ্যে আবু সুফইয়ান ছিলেন প্রথম কাতারের একজন। তিনি রাসূলকে (সা) গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন একাধিকবার। ইসলামের সেই বড়ো দুশমন আজ রাসূলের হাতের মুঠোয়। চারদিকে নাঙ্গা তলোয়ার। রাসূলের (সা) নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় মুসলিমরা উন্মুখ। আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন। মুক্ত করে দেবার নির্দেশ দেন প্রহরীকে। আবু সুফইয়ান এই সব বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যখন বন্ধন খুলে দেয়া হলো তখন তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। এতো দিনের অন্যায় কাজ গুলোর স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে তীরের মতো বিঁধতে লাগলো। অনুশোচনায় ভরে উঠলো তাঁর মন। মুক্তি পেয়েও আবু সুফইয়ান মাক্কায় ফিরলেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলের পাশে থেকে বাকী জীবন ইসলামের সৈনিকরূপে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এবার শহরে প্রবেশের পালা। পেছন দিক থেকে একদল যোদ্ধা প্রবেশ করবে। এই দলের সেনাপতি করা হলো খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে (রা)। সামনের দিক থেকে প্রবেশ করবে আরেক দল। এই দলের পরিচালনায় থাকলেন রাসূল (সা) নিজে। খালিদের (রা) বাহিনীর সাথে ছোট্ট একটি সংঘর্ষ হয়। একদল মুশরিক তীর ছুঁড়ে তিন জন মুসলিমকে শহীদ করে। পাল্টা আক্রমণে শত্রুদের ১৩জন প্রাণ হারায়। বাকীরা পালিয়ে যায়। রাসূলের (সা) পরিচালিত বাহিনীর সামনে আসেনি কেউ। বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। মাক্কায় প্রবেশ করেই আল্লাহর রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন–

যারা আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, তারা নিরাপদ।

যারা আবু সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।

যারা কা'বা গৃহে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপদ।

বিজয় উৎসব

কা'বা থেকে মূর্তি সরিয়ে ফেলা হলো। কা'বার দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র ছিলো। সেইগুলো মুছে ফেলা হলো। রাসূল (সা) ধ্বনি দিলেন "আল্লাহু আকবার"। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো হাজার হাজার কণ্ঠে। রাসূল (সা) কা'বার তাওয়াফ করলেন। মাকামে ইবরাহীমে ছালাত আদায় করলেন। এই ছিলো রাসূলের (সা) বিজয় উৎসব পালন।

বিজয়োত্তর ভাষণ

বিজয় সম্পন্ন হবার পর আসে বিজয়োত্তর ভাষণের পালা। সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন-

"এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন ও সমস্ত শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। জেনে রাখ, সমস্ত গর্ব-অহংকার, সমস্ত পুরোনো হত্যা ও রক্তের বদলা ও সব রক্তমূল্য আমার পায়ের নীচে। কেবল কা'বার তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি সরবরাহ এর ব্যতিক্রম। জাহিলী আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার উপর গর্ব প্রকাশকে আল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। সব মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা) আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

“হে মানুষ, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে নানা গোত্র ও খান্দানে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরিচয় লাভ করতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই বেশী সম্মানার্হ যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।” (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।”

যাদের উৎপীড়নে মুসলিমরা ঘরদোর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা সেখানে উপস্থিত ছিলো। যারা রাসূলকে গালিগালাজ করতো ও তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর টুকরো নিক্ষেপ করতো তারাও সেখানে ছিলো। যারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো তারাও সেখানে ছিলো। যেই পিশাচ রাসূলের আপন চাচা হামজার (রা) কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো সেও সেখানে ছিলো। যারা অসংখ্য মুসলিমকে নির্যাতন করেছে ও শহীদ করেছে তারাও সেখানে ছিলো। যারা মুসলিমদের ঘরদোর ও সম্পত্তি জোর করে দখল করেছে তারাও সেখানে ছিলো। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, “আজ তোমরা আমার নিকট কি আচরণ আশা কর?” উত্তরে তারা বললো–

“আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই ও ভাতিজা।” আল্লাহর রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।”

কুরাইশ নেতাগণ অনুতপ্ত হন। ভেজা চোখ নিয়ে রাসূলের (সা) হাতে হাত রেখে তারা মুসলিম হন।

হুনাইন যুদ্ধ

হিজরী অষ্টম সন।

শাওয়াল মাস।

বারো হাজার সৈন্য নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) হুনাইনের দিকে অগ্রসর হন। এই এলাকায় হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্র মালিক ইবনু আউফ নাযারীকে রাজা বানিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। হুনাইন মাক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। মুসলিম বাহিনী এই উপত্যকায় পৌঁছে। শত্রু সেনারা দুই পাশের পাহাড় থেকে তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছু সংখ্যক মুসলিম মনে করলো যে এবারের যুদ্ধে তো মুসলিমরা জিতবেই। আল্লাহ তাদের এই মনোভাব পছন্দ করেননি।

শত্রুদের তীর বর্ষণের মুখে মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেকেই পিছু হটে। আল্লাহর রাসূল (সা) ও একদল সাহাবী যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন ও যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমদের আহ্বান জানাতে থাকলেন। ভুল বুঝতে পেরে মুসলিমরা আবার এগিয়ে আসে। প্রচণ্ড লড়াই হয়। এই যুদ্ধে ৭০ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। বন্দী হয় হাজারের বেশী লোক। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। যুদ্ধের পর মুসলিমদের প্রশিক্ষণের জন্যে আল্লাহ নিম্নোক্ত বাণী নাযিল করেন–

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

"এবং হুনাইনের দিন। সেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহংকার ছিলো। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। আর তোমরা পিছু হটে পালালে। অতঃপর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা প্রশান্তি ধারা ঢেলে দিলেন। আর এমন বাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখনি। কাফিরদেরকে তিনি শাস্তি দিলেন। এটাই কাফিরদের প্রতিফল।" (সূরা আত তাওবা ঃ ২৫, ২৬)

মূতা যুদ্ধ

হিজরী অষ্টম সন।

জামাদিউল উলা মাস।

সিরিয়া সীমান্ত অশান্ত হয়ে উঠে। সিরিয়া তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ।

সিরিয়া সীমান্তে তখন বেশ কয়েকটি খৃষ্টান গোত্র বাস করতো। তাদের নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছানোর জন্যে আল্লাহর রাসূল (সা) ষোলজন মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন।

খৃষ্টানগণ পনর জন মুসলিম মুবাল্লিগকে হত্যা করে।

দলের নায়ক কা'ব ইবনু উমার আল গিফারী কোন প্রকারে বেঁচে যান। এই দিকে বাসরায় নিযুক্ত রোমের গভর্নর শেরজিল আল্লাহর রাসূলের (সা) দূত হারিস ইবনু উমাইরকে (রা) হত্যা করে।

তাই সিরিয়ার দিকে সৈন্য পাঠানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন হাজার মুসলিম সেনা অগ্রসর হয়।

শেরজিল ১ লাখ সৈন্য নিয়ে সামনে এগুতে থাকে।

রোম-সম্রাট তাঁর ভাই থিওডরের সেনাপতিত্বে আরো ১ লাখ সৈন্য পাঠায়। সম্মিলিত বাহিনী তিন হাজার মুসলিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মূতা নামক স্থানে সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি যায়িদ ইবনু হারিসা (রা), জা'ফর ইবনু আবি তালিব (রা), আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) শহীদ হন। পরে সেনাপতি হন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রা)।

তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। শেষে সৈন্যদের নিয়ে রণাঙ্গনের এক প্রান্তে পৌঁছে যান। রোমান বাহিনী অন্য প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করে। এইভাবে যুদ্ধ থেমে যায়।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সসৈন্যে মাদীনায় ফেরেন।

এই যুদ্ধকালে অন্যতম রোমান সেনাপতি ফারওয়া ইবনু আমার আল জুজামী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রোমানদের হাতে বন্দী হন। রোমান সম্রাট তাঁকে বলেন, "ইসলাম ত্যাগ করে নিজের পদে বহাল হও, তা না হলে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।"

বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি জবাব দেন, "আখিরাতের কামিয়াবী বরবাদ করে দুনিয়ার কোন পদ গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত নই।"

এরপর তাঁকে শহীদ করা হয়। কিন্তু ইসলামের নৈতিক শক্তি দেখে দুশমনরা অবাক হয়ে যায়।

সুদ নির্মূলকরণ

খাইবার যুদ্ধের আগেই সুদ নিষিদ্ধ হয় সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে।

হিজরী অষ্টম সনে এই মর্মে নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হয়।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"যারা সূদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো যাকে শাইতান তার ছোঁয়া লাগিয়ে পাগলের মতো করে ফেলেছে। তাদের অবস্থা এমন এই জন্য যে তারা বলে, "ব্যবসা তো সুদের মতোই।" অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যার নিকট এই বিধান পৌঁছলো সে সুদ থেকে বিরত থাকবে। অতীতে যা খেয়েছে তো খেয়েছেই। সেই ব্যাপারটি এখন আল্লাহর উপর। এই বিধান পাওয়ার পরও যে সুদ খাবে সে নিশ্চিতরূপেই জাহান্নামী। সেখানে সে চিরকাল থাকবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

হিজরী নবম সন।

আল্লাহর রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময় আল্লাহ যাকাত ফারয করেন। যাকাতের ব্যয়খাতও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ.

"ছাদাকাসমূহ (যাকাত) ফকীর, মিসকীন, যাকাত বিভাগের কর্মচারী, নও-মুসলিম, ক্রীতদাস (আযাদ করণের জন্য), ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদ ও অসহায় পথিকদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফারয।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

যাকাত সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের সর্বোত্তম বিধান। সঠিকভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হলে সমাজে ধনী ও নির্ধনের ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে না।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার জন্যও কাউকে পেরেশান হতে হয় না।

আল্লাহর রাসূলের (সা) গড়ে তোলা সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্যই তার বড়ো প্রমাণ।

তাবুক যুদ্ধ

হিজরী নবম সন। রজব মাস।

রোম- সম্রাট আবার সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেন।

খবর পেয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন।

গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম।

দেশে খাদ্যাভাব। ফসল সবেমাত্র পাকতে শুরু করেছে।

দূরত্ব ছিলো অনেক।

মুকাবিলা ছিলো বিশাল বাহিনীর সংগে।

মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হন।

নানা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে মুনাফিকরা।

রজব মাসের খররোদ উপেক্ষা করে ৩০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) রওয়ানা হন।

লক্ষ লক্ষ রোমান সৈন্য তখন অপেক্ষমাণ।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিজে সেখানে উপস্থিত।

৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে এবার মুহাম্মাদ (সা) নিজেই আসছেন, এই খবর গেলো তাঁর কাছে।

এক বছর আগে তিন হাজার মুসলিম সেনা দু'লাখ রোমান সেনার কিভাবে মুকাবিলা করে তাও তাঁর মনে উদিত হয়। ভাবনায় পড়ে যান রোম সম্রাট। যথা সময়ে মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছে। কিন্তু শত্রু সেনাদের কোন চিহ্ন দেখা গেলো না। জানা গেলো, সবদিক ভেবে রোম সম্রাট সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়াই উত্তম মনে করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) তাবুকে দশ দিন অবস্থান করেন। সীমান্ত অঞ্চলে শাসন-শৃঙ্খলা সুসংহত করেন।

এরপর মাদীনায় ফিরে আসেন।

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তাবুক থেকে ফেরার পথে নাযিল হয় সূরা আত তাওবা।

এখন থেকে মুনাফিকদের প্রতি কি আচরণ করতে হবে এই সূরার একাংশে আল্লাহ তা বলে দেন।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ قُلْ

نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ. وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ.

"যাদেরকে পেছনে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো তারা আল্লাহর রাসূলের সংগে না যাওয়ায় ও ঘরে বসে থাকতে পারায় খুব খুশী হয় এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ নিয়োজিত করে জিহাদ করা তাদের সহ্য হলো না। তারা লোকদের বললো, এই কঠিন গরমে বের হয়ো না। এদের যদি একটুও চেতনা হতো! এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী কাঁদা। কেননা, তারা যেই পাপ উপার্জন করেছে তার শাস্তি এই।

আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনেন ও ভবিষ্যতে এদের কোন দল যদি তোমার নিকট জিহাদে শরীক হবার অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, এখন তোমরা আমার সাথে যেতে পারবে না। না আমার সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তোমরা ঘরে বসে থাকা পছন্দ করেছো, এখনও ঘরে বসে থাকা লোকদের মধ্যেই থাক।

আর তাদের কেউ মারা গেলে তুমি জানাযা পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে ও ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৮১-৮৪)

মুনাফিকরা মাদীনার উপকণ্ঠে একটি মাসজিদ নির্মাণ করে ছিলো। সেখানে বসে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

"যারা ক্ষতিসাধনের মানসে, কুফরের প্রসারকল্পে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছে– উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের জন্য তা হবে মন্ত্রণালয়। তারা শপথ করে বলে যে, আমরা নেক উদ্দেশ্যেই তা নির্মাণ করেছি। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আত তাওবা ঃ ১০৭)

আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশে মুনাফিকদের এই মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়।

আল্লাহর রাসূলের হাজ্জ

হিজরী দশম সন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হাজ্জ পালনের জন্যে মাক্কায় আসেন।

এই হাজ্জে লক্ষাধিক মুসলিম সমবেত হন।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে তিনি আরাফাত প্রান্তরে পৌঁছেন।

আরাফাতের বুকে দাঁড়িয়ে আছে জাবালুর রাহমাত বা রাহমাতের পাহাড়।

এই পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) উপস্থিত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন।

ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"শোন, সব জাহিলী বিধান আমার দুই পায়ের নীচে।

অনারবদের উপর আরবদের ও আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

মুসলিমরা পরস্পর ভাই-ভাই।

তোমাদের অধীন ব্যক্তিগণ!

তোমাদের অধীন ব্যক্তিগণ!

তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে।

নিজেরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে।

জাহিলী যুগের সব রক্তের বদলা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের রাবিয়া ইবনুল হারিসের পুত্রের রক্তের বদলা বাতিল করে দিলাম। জাহিলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের আলআব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করে দিলাম।

নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। নারীদের উপর তোমাদের ও তোমাদের উপর নারীদের অধিকার রয়েছে।

আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন সম্মানার্হ, তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত তেমনি সম্মানার্হ। আমি তোমাদের মাঝে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

আল্লাহর সর্বশেষ বাণী

ভাষণ শেষে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

"আল্লাহ তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি বলবে?

মুসলিমরা বললেন, "আমরা বলবো আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছেন।"

রাসূল (সা) বললেন,

"আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।

আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।"

এই সময়ে নাযিল হয় আল- কুরআনের সর্বশেষ আয়াত ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজকে আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত পূর্ণ

করে দিলাম। আর দীন হিসেবে কেবল ইসলামকেই তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩)

সর্বশেষে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন,

"তোমরা যারা উপস্থিত অনুপস্থিতদের কাছে এই সব পৌঁছিয়ে দেবে।"

রাসূলের (সা) শেষ ভাষণ

হিজরী একাদশ সন।

সফর মাসের মাঝামাঝি।

আল্লাহর রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ক্রমশঃ তাঁর অসুস্থতা বাড়তে থাকে। তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে ছালাতের ইমামতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই আবু বাকর (রা) ইমামতি করতে থাকেন।

মাঝখানে একদিন তিনি খানিকটা সুস্থ হয়ে মাসজিদে আসেন।

উপস্থিত মুসলিমদের উদ্দেশ্য একটি ভাষণ দেন।

এটাই তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ।

ভাষণে তিনি বলেন,

"আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নিয়ামত কবুল করার অথবা আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা কবুল করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা আল্লাহর নিকটের জিনিসই কবুল করে নিয়েছে।

আমি সবচাইতে বেশী ঋণী আবু বাকরের সম্পদ ও তার সাহচর্যের কাছে।

দুনিয়ায় কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আবু বাকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের চেয়ে ইসলামের ভ্রাতৃত্বই উত্তম।

শোন, অতীতের কাউমগুলো তাদের নবী ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের কবরগুলোকে ইবাদাতগাহ বানিয়ে নিয়েছে।

তোমরা এরূপ করো না। আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে নিষেধ করছি।

হালাল ও হারাম আমার প্রতি আরোপ করা যাবে না।

আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন আমি তা-ই হালাল করেছি।

আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন আমি তা-ই হারাম করেছি।”

একদিন তাঁর রোগ যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেলো।

তিনি কখনো চাদর টেনে মুখের উপর দেন। কখনো তা সরিয়ে নেন।

এ অবস্থায় তিনি বলে উঠেন।

“ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতগাহ্ বানিয়ে নিয়েছে।”

ইন্তিকাল

হিজরী একাদশ সন।

রবিউল আওয়াল মাস। সোমবার।

দিন গড়াতে থাকে।

আল্লাহর রাসূল (সা) বারবার বেহুঁশ হতে থাকেন।

হুঁশ ফিরে এলেই তিনি এক একবার এক একটি বাক্য উচ্চারণ করতেন।

বাক্যগুলো হচ্ছে–

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

“আল্লাহ যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন তাঁদের সাথে।”

اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

“হে আল্লাহ, মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে।”

بَلِ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى.

“তিনিই মহান বন্ধু”

তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

এক সময় তাঁর দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেলো।

শীতল হয়ে গেলো দেহ।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

– সমাপ্ত –